আমেরিকা-ইউরোপ দূরত্ব বাড়ছে

সম্ভবত আগামী ২৫ ডিসেম্বরের আগেই ইরাকে হামলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ব্যাপারে ইউরোপের সমর্থন বা নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট লাভের সম্ভাবনা কতখানি... লিখেছেন জহিরুল আলম ও হাসান মূর্তাজা

গেল শরতে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বিমান হামলার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় ইউরোপ। আফগানিস্তানে হামলার প্রস্তুতি পর্বে ন্যাটোর ৫ম অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। বলা হয়, আমেরিকার ভূখন্ডে আক্রমণ ইউরোপে আক্রমণের সমতুল্য। অন্যদিকে ফ্রান্সের প্রভাবশালী দৈনিক লা মন্দ সম্পাদকীয় ছাপে 'আমরা সবাই আমেরিকান'।

এক বছর পর সেই চিত্র অন্যরকম। আটলান্টিকের অপর পাড়ের মার্কিন মিত্ররা এখন আগের মতো অতটা উষ্ণ নয়। ইরাকে মার্কিন হামলার বিরোধী তারা। যদিও ব্রিটেন আগের মতোই বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছে। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানিসহ আরো বেশ ক'টি দেশ ইরাকে হামলার বিরোধিতা করছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটেনে লক্ষাধিক লোকের যুদ্ধবিরোধী মিছিলে স্লোগান উঠেছে, ব্লেয়ারকে বুশের লেজুরবৃত্তি ছাড়তে হবে। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৬১ ভাগ ব্রিটিশ নাগরিক যুদ্ধের বিরোধী।

প্রশ্ন হলো, পরিস্থিতিটা এমন বদলালো কিভাবে? বিশ্লেষকরা বলেন, ইরাকের ব্যাপারে মার্কিনিদের সঙ্গে ইউরোপের মতপার্থক্যের মূল কারণ ফিলিস্তিন ইস্যু। ইউরোপীয় মত হলো, ফিলিস্তিনিরা একটি স্বাধীন দেশ চায়। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য কোনোদিনই

যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন কফি আনান

স্থিতিশীল হবে না। এ সমস্যা সমাধানের আগেই ইরাক আক্রমণের অর্থ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির বিস্ফোরণ। ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকরা বিষয়টিকে ভিন্ন চোখে বিশ্লেষণ করেন। এদের যুক্তি হলো, ইরাকই মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলছে, কারণ তারা ফিলিস্তিনি জঙ্গিবাদে মদদ দেয়। কাজেই

কাশ্মীর নির্বাচন

কুপওয়ারা শহরে নির্বাচনী মিছিলের ওপর নজর রাখছে সেনা সদস্যরা

'ভোট দিলে কি শান্তি আসবে' ফল বিক্রেতা সাইফুল্লাহ্‌র প্রশ্নটি যেন কাশ্মীরের ৫৬ লাখ ভোটারের সবার। ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ চার পর্বে শেষ হবে ৮ অক্টোবর। ১২ অক্টোবর নাগাদ জানা যাবে কে বা কারা হচ্ছেন পরবর্তী ছয় বছরের জন্য কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিধায়ক।

কাশ্মীরের দীর্ঘদিনের সমস্যার কতটুকু সমাধান এই নির্বাচন দিতে পারবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। এর অন্যতম কারণ, স্বাধীনতাকামী মুসলিম সংগঠনসমূহের জোট 'অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স' এই নির্বাচন বর্জন করেছে। শুধু তাই নয় সশস্ত্র সংগঠনগুলো নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত সরকার যেকোনো মূল্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংকল্পবদ্ধ। পরিণতিতে আরেক দফা রক্তপাত। ২২ আগস্ট নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৫০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মুশতাক আহমেদ লোনও রয়েছেন। এমনকি দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণের দিন মুজাহিদদের আক্রমণে নিরাপত্তারক্ষীসহ ৬ জন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে নিরাপত্তাকর্মীরা ২ জন মুজাহিদসহ একটি ভবন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে।

ওমর আবদুল্লাহ হচ্ছেন কাশ্মীরের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী

একথা সত্য, কাশ্মীর সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে কাশ্মীরে স্বাধীনতা আনা অকল্পনীয়। নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কাশ্মীরি জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ কাশ্মীর সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। নির্বাচন নিয়ে কাশ্মীরি জনগণের আশাভঙ্গের ইতিহাস দীর্ঘ। '৫১ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে শুরু করে '৯৬ সালের সর্বশেষ নির্বাচনী- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সরকার কাশ্মীরি জনগণের ইচ্ছা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। দিল্লি যখনই দেখছে স্বাধীনতাকামী, জাতীয়তাবাদী কোনো নেতা কাশ্মীরের নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, তখনই তাকে গ্রেপ্তার কিংবা প্রভাবিত করেছে।

তারা ইরাক, ইরান এমনকি সৌদি আরবেও ক্ষমতার পরিবর্তন চায়। এসব কথাবার্তা উদ্বেগ সৃষ্টি করছে ইউরোপে।

বার্লিনে জার্মান ফরেন রিলেশন্স কমিটির সদস্য হেনিং রিকে বলেন, ইরাকে সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে জার্মানি যতটা বিরক্ত, একইভাবে আমেরিকান ঔদ্ধত্যপনায়ও ক্ষুব্ধ। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে দূরত্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর অথচ প্রচলিত একটি ধারণা, হলো পরস্পরের মৌলিক মূল্যবোধ ও স্বার্থের ক্রম বিভক্তি। এই ধারণাটিই প্রতিফলিত হয়েছে মার্কিন লেখক রবার্ট কেগ্যানের সাম্প্রতিক আরেক নিবন্ধে। তার এই লেখাটি নিয়ে ইউরোপে বিশেষ করে ব্রাসেলসে বেশ আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে একটি স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত আইনকানুন এবং বহুজাতিক আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার ব্যাপারে ইউরোপের আগ্রহ রয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, আন্তর্জাতিক আইনের ওপর নির্ভর করা যায় না। সত্যিকারের নিরাপত্তা এবং উদারপন্থী বিশ্ব ব্যবস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণ ও সামরিক শক্তির ওপর। বহু ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকও মনে করেন, মি. কেগ্যান মনোভাবের দিক থেকে আসল তফাতটাই তুলে ধরেছেন। ইরাক ইস্যু তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়েই বলছে, তারা ইরাকে হামলা সমর্থন করবে, যদি তা জাতিসংঘ অনুমোদন করে।

প্রশ্ন হলো, আমেরিকার কাছে কি এটা কোনো গুরুত্ব বহন করে ? আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের পলিসি প্ল্যানিংয়ের প্রধান রিচার্ড

লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। দিল্লি কাশ্মীরে সবসময় অনুগত সরকার দেখতে চেয়েছে। ফলে '৮৭-র নির্বাচনে নিকৃষ্টতম কারচুপির আশ্রয় নেয় ভারত সরকার। এই প্রহসনের নির্বাচনই '৮৯ সাল থেকে কাশ্মীরিদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই এবারের নির্বাচনেও স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। যদিও বড় রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ যেমন- ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টি (এনসিপি); পিপলস ডেমক্রেটিক পার্টি (পিডিপি); বিজেপি এবং কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এসব সংগঠন মনে করছে, কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই কাশ্মীরি জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। কিন্তু কাশ্মীরের ৫৬ লাখ ভোটারের একটা বড় অংশ মনে করে, এসব রাজনৈতিক দল বিশেষত ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টি প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের স্বাধীকারের প্রশ্নে ছাড় দিয়েছে। এ ধরনের অভিযোগ ওঠার কারণও রয়েছে। এনসি কেন্দ্রে বিজেপি'র সমর্থক। তাছাড়া এনসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান ওমর আবদুল্লাহ কেন্দ্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র মন্ত্রী। সব মিলিয়ে এই নির্বাচন কাশ্মীরের জনগণকে একটা বিভ্রান্ত অবস্থায় ফেলেছে। যদিও অনেক ভোটার মনে করে, শুধু কাশ্মীরের মর্যাদার প্রশ্নটিই একমাত্র ইস্যু হওয়া উচিত নয়। কাশ্মীরের অর্থনৈতিক অবস্থা, বেকারত্ব, শিক্ষা, মানবাধিকারের মতো মৌলিক বিষয়গুলোও নজরে আনা উচিত। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর পর থেকে কাশ্মীরের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন খারাপ হয়েছে, তেমনি ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাও ঘটছে। স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার যেহেতু তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব নয়, এই ইস্যুগুলো উপেক্ষিত হওয়ার অর্থ কাশ্মীরিদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়া।

সব পক্ষই নির্বাচনে ভোটার অংশগ্রহণকে তাই বড় করে দেখছে। ভারত সরকার বলছে, প্রথম দু'পর্বেই যথাক্রমে ৪৪ ও ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। যদিও এই ভোট প্রদানের হার সর্বত্র সমান নয়। দ্বিতীয় পর্বে শ্রীনগরে ভোট পড়েছে কেবল ১১ শতাংশ। তাই ভোট গণনার হারকে জনমতের মানদন্ড ধরা ভুল হবে। তবুও দিল্লি মনে করে, ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতির অর্থ স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলো উপেক্ষিত হওয়া। অন্যদিকে ভোট প্রদানের হার কম হওয়ার মানে নির্বাচন প্রত্যাখ্যাত হওয়া। তাই সরকার যেকোনো উপায়ে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে চায়। ব্যাপক নিরাপত্তা গ্রহণের পাশাপাশি জোর করে কেন্দ্রে নিয়ে ভোটদানে বাধ্য করার মতো ঘটনাও তাই ঘটছে। অন্যদিকে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয়নি। ফলে ভোট প্রক্রিয়া কতোটুকু অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলা মুশকিল। পাকিস্তানের পাশাপাশি স্বাধীনতাকামী সংগঠন এই নির্বাচনকে তাই প্রত্যাখ্যান করে একে 'প্রহসন' আখ্যা দিয়েছে। সব মিলিয়ে বলা চলে, কাশ্মীরের চলমান বিধানসভা নির্বাচন পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন আনবে না। ভারত সরকার দাবি করবে, জনগণ ভোটে অংশ নিয়ে প্রমাণ করেছে তারা বৃহত্তর ভারতের অংশ হিসেবেই থাকতে চায়। এভাবে উপেক্ষিত হবে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারক গণভোটের প্রশ্নটি। অন্যদিকে, স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠনগুলো বলবে, এই নির্বাচন প্রহসন। অতএব অস্ত্রই সমাধান।

হাসান মূর্তাজা

নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তাকর্মীদের সাহায্য করার জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন

হ্যাস বলেন, ইইউ'র ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি স্টাডিজের একটি কনফারেন্সে জুনে এ ধরনের কিছু বিষয় উঠে এসেছিল। এটা আটলান্টিকের দুই পারের সংকট নয়, এটা হলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইউরোপীয়দের প্রয়োজনীয়তা ফুরোবার। আমেরিকানরা মনে করে তারা যুদ্ধ বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপকে পরিপূর্ণ মুক্ত করার দায়িত্ব শেষ করেছে, কাজেই এখন আমেরিকায় নীতিনির্ধারণে প্রভাবশালী থাকার জন্য ইউরোপকেই বরং নিজে থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মতো এমন কিছু স্থানে জড়াতে হবে, যেখানে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। কিন্তু ইউরোপ পোষণ করে ভিন্নমত।

সম্প্রতি পিউ সেন্টার একটি জরিপে প্রশ্ন রাখে, আমেরিকা কি আসলে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে এসব করছে? তখন ৮০ ভাগ ফরাসি, ৮৫ ভাগ জার্মান ও ৭৩ ভাগ ব্রিটিশ একমত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ইউরোপীয়রা মার্কিনীদের মত 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ' তাড়াতে আগ্রহী নয়।

নতুন প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক

ইউরোপ ও আমেরিকার মাঝে নীতিগত ফারাকটি এখন আরো বেশি স্পষ্ট। বিশেষত জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাকে ফেরার নিঃশর্ত অনুমতি দেয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে একই ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যেও বিভেদ পরিষ্কার। যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো ছুতোয় ইরাক আক্রমণ করতে চাইছে- এটা সবাই বুঝতে পারছে। যে কারণে এই দ্বিধাবিভক্তি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট ও ব্রিটেন জাতিসংঘে একটি নতুন প্রস্তব পাস করাতে চাইছে। এতে ইরাককে অস্ত্র পরিদর্শকদের ফিরিয়ে নিতে ৭ দিনের সময় বেঁধে দেয়া হবে। অন্যদিকে ইরাক পরিদর্শকদের কাজে বাধা দিলে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুটি ব্যবস্থাই রাখা হবে একটি প্রস্তাবে। এদিকে রাশিয়া বলছে, নতুন কোনো প্রস্তাবের প্রয়োজন নেই। বরং জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই একমাত্র কাজ। জার্মানি ইরাকে হামলার বিরুদ্ধে দারুণ সোচ্চার। এ নিয়ে দু'দেশের সম্পর্কে টানাপড়েনও সৃষ্টি হয়েছে। তবে চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার জানিয়েছেন, ইরাক প্রশ্নে তার অবস্থান পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে ফ্রান্স মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছে। ফ্রান্স একটির

পরিবর্তে দুটো প্রস্তাব পাস করার পক্ষে। প্রথমটি জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের ইরাক প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে। এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় প্রস্তাব যাতে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খোলা রাখা হতে পারে। অর্থাৎ, ফ্রান্স সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করছে না। করছে শর্তসাপেক্ষে। অন্যদিকে বেলারুশে ন্যাটো প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকেও যুক্তরাষ্ট্র নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। সব মিলিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় মিত্রদের যেভাবে কাছে পেয়েছিল, এবার তেমনটি পাবে না।

প্রতিবাদ ভেতর থেকে

ইতিপূর্বে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ইউরোপে কখনই এতোটা বিতর্কের মুখে পড়েনি। শুধু তাই নয়, বুশ প্রশাসন ইরাকের শাসনক্ষমতায় যে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করেছেন, নিজ দেশেও তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ মার্কিনি যুক্তরাষ্ট্রের একক সিদ্ধান্ত নেয়ার বিরোধী। অন্যদিকে, কংগ্রেসেও প্রেসিডেন্ট বুশের প্রস্তাব যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। বর্ষিয়ান ডেমোক্রেটিক নেতা অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি ইরাকে হামলার বিরোধিতা করে বলেছেন, ইরাক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি- বুশ এ কথা প্রমাণ করতে পারেননি। এছাড়া জিম ম্যাকডারমটের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ডেমোক্র্যাট সিনেটরদের প্রতিনিধিদল ইরাক সফরে গিয়ে সম্ভাব্য হামলার সমালোচনা করেছেন। সবচেয়ে বড় সমালোচনা এসেছে গেল নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-গোরের মুখ থেকে। তিনি বুশকে কটাক্ষ করে হামলাকে অনর্থক আখ্যা দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বুশ যে কেবল ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নয়, নিজ দলের অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতার সমালোচনাও তাকে হজম করতে হচ্ছে। সিনিয়র বুশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেনট স্কোক্রফট সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি কলামে লিখেছেন, 'ডোন্ট অ্যাটাক সাদ্দাম'। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রথম বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্স ইগলবার্জার, ইন্ডিয়ানার সিনেটর ডিক লুগার, নেব্রাস্কার চাক হেগেল প্রমুখ। এছাড়া রিপাবলিকান পার্টির কংগ্রেস সদস্যদের সেকেন্ড ম্যান ডিক আর্মি বলেছেন, সাদ্দাম হোসেনের উসকানি আমেরিকার যুদ্ধযাত্রার জন্য যথেষ্ট নয়।

শুধু বুশ নয়, ইউরোপে তার অন্যতম মিত্র টনি ব্লেয়ারও একই সমস্যা মোকাবেলা করছেন। সম্প্রতি রাজধানী লন্ডনে লক্ষাধিক

স্বেচ্ছামৃত্যুর আন্দোলন

নেদারল্যান্ডসে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর অধিকার আইন আগেই পাশ হয়েছে। আইনটি প্রণয়নের জন্য অস্ট্রেলিয়াতেও প্রবীণরা আন্দোলন করেছেন। এখন ব্রিটেনে চলছে আইনটির সমর্থনে জোর বিক্ষোভ সমাবেশ... লিখেছেন জামান আরশাদ

'ডক্টর ডেথ' নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বছর দুই-তিন আগে অস্ট্রেলিয়ার এই ডাক্তার ইউথানাসিয়া বা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আইন প্রণয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী এতোটাই প্রচারণা চালিয়েছেন যে, আসল নামটি হারিয়ে 'ডক্টর ডেথ' নামে তিনি রাতারাতি পরিচিত হয়ে ওঠেন। 'যেসব প্রবীণ ব্যক্তি কঠিন রোগে ভুগছেন, যাদের বাঁচার সম্ভাবনা নেই, এখন শুধুই সময়ক্ষেপণ করছেন, তাদের স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের সুযোগ দেয়া উচিত। বৃদ্ধ বয়সের যন্ত্রণা এড়াতে তারা যদি মৃত্যু চান, তাহলে তাকে সে সুযোগ দেয়া মানবাধিকারের অংশ। এক্ষেত্রে দ্রুত ক্রিয়াশীল ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের মৃত্যু কার্যকর করা যায়'– ডক্টর ডেথ এসব আচমকা কথা বলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। পুরো বিষয়টি ছিলো দারুণভাবে সংবেদনশীল। কারণ যখন ইচ্ছে মরবো, এটা ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার। এ ধরনের স্বার্থপর প্রচারণা সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় ইউরোপকে। হলান্ড, ব্রিটেনসহ কয়েকটি দেশের প্রবীণরা

লন্ডনের রাস্তায় এক মহিলার ফরিয়াদ

'ডক্টর ডেথ'-এর সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে। কট্টরপন্থি নেতারা এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। তারপরও নেদারল্যান্ডস সরকার প্রবীণদের দাবির মুখে আইনটি প্রণয়ন করে। তাও প্রায় বছরকাল আগের ঘটনা।

এবার এখনকার কিছু কথা। ব্রিটেনে এখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আইনের জন্য জোর দাবি চলছে। ব্রিটেনে যিনি আন্দোলনটি শুরু করেছিলেন তার নাম ডায়ানা প্রিটি। একাধিক রোগের সম্মিলিত যন্ত্রণা ভোগের পর এ বছরের মে মাসে তার মৃত্যু হয়েছে। আইনটির জন্য এবার প্রচারণা শুরু করেছেন তার স্বামী ব্রায়ান প্রিটি। মটর নিউরনের মতো যন্ত্রণাদায়ক রোগে স্ত্রীর মৃত্যু স্বামী হিসেবে তিনি সহ্য করতে পারেননি। ব্রায়ান ৫০ হাজার প্রবীণ ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত একটি দরখাস্ত প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে দিয়েছেন। এর আগে তিনি আইনি যুদ্ধে ব্রিটেনের আদালতে পরাজিত হয়েছেন। এখন তার আইনি যুদ্ধ চলছে ইউরোপিয়ান আদালতে। ভলানটারি ইউথানাসিয়া সোসাইটি ও সিভিল রাইটস গ্রুপ লিবার্টি নামে দুই মানবাধিকার সংস্থা এই আন্দোলনে ব্রায়ান ও তার সহযোগীদের সমর্থন দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের বাইরে দাঁড়িয়ে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার ব্রায়ান বলেন, আপনারা জানেন, আমার প্রয়াত স্ত্রী ডায়ানা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আইনের জন্য আন্দোলন করে গেছে। তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আমি ও আমার বন্ধুরা আজ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়েছি। টনি ব্লেয়ারকে আমরা বলতে চাই, আপনি আসুন, উপস্থিত প্রবীণদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করুন। তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর জন্য আইন চায়।

ওইদিন বিবিসিকে তিনি বলেন, আইনগত সকল প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। অর্থাৎ আদালতে আমরা পরাজিত হয়েছি। তবে আমি আশা করি, প্রবীণদের চাপ সরকারকে এই আইনটি প্রণয়ন করতে বাধ্য করবে। বেড ফোর্ড শায়ারের লিউটনের বাসিন্দা ব্রায়ান তার প্রয়াত স্ত্রীকে স্মরণ করে বলেন, গত মে মাসে আমি তার মৃত্যু দেখেছি, সে বাঁচবে না, তা আগেই জানতো। এজন্যই যন্ত্রণা এড়াতে চেয়েছিল। ইচ্ছা অনুযায়ী মৃত্যুর অধিকারের জন্য সে আদালতে প্রায় এক বছর ধরে লড়াই করেছে। কিন্তু যন্ত্রণার শীতল স্পর্শের ছোবলেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার প্রথমে ডাউনিং স্ট্রিটের বক্তৃতা শেষে বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দেয়ার পরপরই তিনি কনসারভেটিভ সেন্ট্রাল অফিসে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার আক্রান্ত জেন ম্যাকডোনাল্ড, মটর নিউরন আক্রান্ত জন হাওয়ার্ড, এইডস আক্রান্ত স্টিভ বার্কসবি, হান্টিংডনস জিন আক্রান্ত লিসা কুক। বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নেন। স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আইনের দাবিতে প্রয়োজনে তারা দেশ জুড়ে আন্দোলন করবেন। একটি ওয়েবসাইট খোলার সিদ্ধান্ত হয়, যেখানে মৃত্যুপথযাত্রীরা তাদের কষ্টের কথা জানাবেন। উত্তর লন্ডন থেকে আসা জেন ম্যাকডোনাল্ড বলেন, 'আমি জানি উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করেও আমি অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবো। কিন্তু এখন আমার জীবনের আর মূল্য নেই। তাই আমি এখন একটা সুযোগ চাই, যাতে নিরাপদে মরতে পারি'।

ব্রিটেনের জনগণের মধ্যেও স্বেচ্ছায় মৃত্যুর আইনের ব্যাপারে বেশ সাড়া পড়েছে। সম্প্রতি একটি মতামত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, ৮০ শতাংশেরও বেশি ব্রিটিশ মনে করে আইনটি প্রণয়ন করা উচিত। ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের মধ্যে সমর্থন বাড়ছে। ডায়ানা প্রিটির মৃত্যুর সময়ে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির এমপি মি. ডেভিস তার আইনি যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, মানুষকে তার নিজস্ব অবস্থানে রেখে সসম্মানে যন্ত্রণা ছাড়াই মৃত্যুর সুযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু আইনটির বিরোধিতা করে ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যাওয়ারনেস ইন অ্যাকশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক র‍্যাশেল হার্স্ট বলেন, কোন ধরনের মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর সুযোগ পাবে, সেটা নির্ধারণ করা বিচারকদের জন্য খুবই বিভ্রান্তিকর হবে। এটা হবে একটা পিচ্ছিল ঢালু জায়গা, যেখানে থেকে যে কেউ গড়িয়ে জলে পড়তে পারে। অর্থাৎ র‍্যাশেল বলতে চাচ্ছেন, রোগ-শোকের যন্ত্রণা ভোগ করেও যেসব প্রবীণ স্বেচ্ছায় মৃত্যু চায় না, এই আইনের মাধ্যমে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া শুধু প্রবীণদের ক্ষেত্রে নয়, কোনো তরুণ যদি কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু চায় তবে তাকেও কি সেই সুযোগ দেওয়া হবে? এ প্রশ্নটির মীমাংসাও বাকি রয়েছে।

নেদারল্যান্ডসে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর ইউরোপের উদারপন্থি রাজনীতিবিদরা বলছেন, স্বেচ্ছায় মৃত্যুর অধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু কট্টরপন্থিরা বলছেন, যখন খুশি তখন মরবো এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হলে তা হবে প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ। এ ক্ষেত্রে কট্টরপন্থিদের যুক্তিটিই বেশি সঠিক বলে মনে হয়। এ কারণেই হয়তো সরকার তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবে সরকারের একেবারে গুরুত্ব না দেয়ার কারণ নেই। আইনটির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য বিষয়গুলো আগে ভালোভাবে বিবেচনা করতে হবে। তারপর আইন প্রণয়নের প্রসঙ্গ।

মানুষের যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয়েছে। এছাড়া ব্লেয়ার পার্লামেন্টের ভাষণে ইরাকের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের কথা বললেও সাদ্দামকে উৎখাতের কোনো কথা বলেননি। বিশ্লেষকরা এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে তার নীতিগত পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদিকে ব্লেয়ার তার দেশের জনমতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দেয়ায় লেবার পার্টির বেশ ক'জন সংসদ সদস্যের তোপের মুখে পড়েছেন। এদের একজন জর্জ গ্যালাওয়ে। তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করে বলেছেন, এর ফলে ইরাকি জনগণের দুর্দশাই কেবল বাড়বে।

সব মিলিয়ে আটলান্টিকের দুই পাড় এখন বিভক্ত। এই বিভক্তি বাড়বে না কমবে, ভবিষ্যৎই তার উত্তর দেবে।